১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
পপুলার সিরিজ
বৈশাখ ১৩২৭
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পয়লা-নম্বর
ভাক বার্ষিক মূল্য ৪৲
প্রতি সংখ্যা ।৶, ভিঃ পিতে ॥
শিশির পাবলিশিং হাউস ।

শিশুতোষ সিরিজ

শিশির পাবলিশিং হাউস,—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

পয়লা নম্বর।
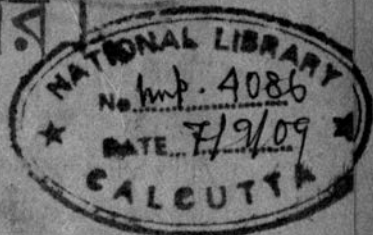
আমি তামাকটা পর্য্যন্ত খাইনে। আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্য্যন্ত শুকিয়ে মরে গেচে। সে আমার বই পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিল এই :—

> যাবজ্জীবেৎ নাই বা জীবেৎ
> ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।

যাদের বেড়াবার সখ বেশী অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা যেমন করে টাইম-টেবল্ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসদ্ভাবের দিনে আমি তেমনি করে বইয়ের ক্যাটালগ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়-শ্বশুর বাংলা বই বেরবামাত্র নির্ব্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহঙ্কার এই যে সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্য্যন্ত খোওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য আর কারো

ঘটে না। কারণ ধন বল, আয়ু বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যত কিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে দাদার খুড়-শ্বশুরের বইয়ের আলমারীর চাবি দাদার খুড়-শাশুড়ির পক্ষেও দুর্লভ ছিল। "দীন যথা রাজেন্দ্র সঙ্গমে" আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম ঐ রুদ্ধদ্বার আল্‌মারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েচি। তখন আমার চক্ষুর জিভে জল এসেচে। এই বল্লেই যথেষ্ঠ হবে ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব রকম বেশী পড়েচি যে, পাস্‌ করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল্‌-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায়, বিদ্যার তোলা জলে আমার স্নান নয়—স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি এ, এম্‌ এ, এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক্‌ আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মত, আঠারো উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্ক্রু দিয়ে আঁটা, বাংলা দেশের ছাত্রের দল পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে

থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহুকষ্টে মিল বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল রাস্কিনে এসে কাৎ হয়ে পড়েচে। মাষ্টার মশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরয় না।

কিন্তু আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মত করে মনটাতে বেঁধে রেখে জাওর কাটাচ্চি সে দেশে সাহিত্যটা ত স্থানু নয়—সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেচি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসী জর্ম্মান ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে সুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে একস্‌প্রেস্ গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেচে, আমি তারই টিকিট কিনেচি। তাই আমি হাক্‌স্‌লি ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাই নি, টেনিসন্‌কেও বিচার করতে ডরাইনে, এমন কি, ইবসেন মেটারলিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখচি বাংলাদেশে এমন ছেলেও দু'চারটে মেলে যারা কলেজও

ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল—বকুনি। ভদ্র-ভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারিদ্দিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনি তা একদিকে এত কাঁচা অন্যদিকে এত পুরণো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্‌সা গুমোট-টাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হচ্চে অদ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারো সময় অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্রচিহ্নিত একখানা নূতন প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত—তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায় তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ বা সদ্য কলেজের নোট নেওয়া খাতাখানা নিয়ে

বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেছি সাহিত্য চর্চ্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিস্কে নয় রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু যাঁর ভরসায় এই সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কি হয় সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে সকল বড় বড় কুলাল চক্র ঘুরচে, যাতে মানব সভ্যতা কতক বা তৈরি হয়ে আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠচে, কতক বা কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়চে তার কাছে ঘরকরনার নড়াচড়া এবং রান্নাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে?

ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গী ভবই জানেন এমন কথা কাব্যে পড়েচি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষু; আমার এক জোড়া-মাত্র—তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বল্লে আমার স্ত্রীর ভ্রূ-চাপে কি রকম চাপল্য উপস্থিত হত তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তালকানা, এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে

পয়লা নম্বর।

ঊনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যা-কিছু অর্থসামর্থ্য তার একটীমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্চে বই কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মত এই আমার সখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও শুঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশী জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মত লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নয়, পরের উপকার করবার জন্যেও নয়; ওটা হচ্চে কথা কয়ে কয়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়াম-প্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম, কিম্বা অধ্যাপক হতুম তাহলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না—যারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের উপ্‌র হন্‌হন্ করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার দ্বৈত দলটি জমে নি—তখন আমার একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেচেন। যদিচ তিনি পরতেন মিল্‌-এর সাড়ি, এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না কিন্তু

স্বামীর কাছ থেকে যে-আলাপ শুনতেন—সৌজাত্য বিদ্যাই (Eugenics) বল, মেণ্ডেল তত্ত্বই বল, আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বল—তার মধ্যে সস্তা কিম্বা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দল বৃদ্ধির পর হ'তে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনি নি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কি তা আমি জানি নে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয় ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক নামটার আসল মানে—আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান্ তখন সেই ছোট ছেলেকে যত্ন করবার মনোরম উপায়স্বরূপে আমার শ্বশুর আর একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কি রকম সফল হয়েছিল তা এই বল্লেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বল্লেন, "মা, আমি ত যাচ্চি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের জন্যে কি ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা

প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বল্লেন, এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার নেই—নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। আমাব শ্বশুর কেবল বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারো উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমাব সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তার মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য এমন ধারণা যে তাঁর কি করে হল তা ত বল্‌তে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তাহলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগত দিতে পারতেন না। আসল তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয যুগের ফিলিস্‌টাইন, আমাকে শেষ পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা যখন

আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম ও বুঝি সাহস করচে না। শেষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, "সরোজের পড়াশুনোর কি করচ?" অনিলা বল্লে, "মাষ্টার রেখেচি, ইস্কুলেও যাচ্চে।" আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েচে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁও বল্লে না, নাও বল্লে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি কলেজে পাস করিনি সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য, অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যা কিছু বলেচি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝে নি। ও হয়ত মনে করেচে সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশী জানে। কেননা মাষ্টারের হাতের কান-মলার প্যাঁচে প্যাঁচে বিদ্যে-গুলো আঁট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেচে। রাগ করে মনে মনে বল্লুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ।

পয়লা নম্বর।

সংসারে অধিকাংশ বড় বড় জীবন-নাট্য যবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার দ্বৈতদের নিয়ে বের্গসর তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করচি তখন মনে করেছিলুম অনিলার জীবন-যজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্বলে নি। কিন্তু আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই যে-সৃষ্টিকর্ত্তা আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন অনিলার মর্ম্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুকী যে পৌরানিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠচে। সেই চল্‌তি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকরনার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চল্‌তে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্য্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে? অন্তত আমি ত কিছুই বুঝি নি। কত উদ্বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার

এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগ পর্ব্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব্ব। আজ বেশ বুঝতে পারচি পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটভাইটিই দিদির সবচেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ওদিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কি রকম চল্‌চে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পয়লা নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তারপরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেচে, দুটি একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্পদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এত বড় বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন—মনে কর তাঁর নাম রাজা সিতাংশু মৌলি—এবং ধরে নেওয়া যাক্ তিনি নরোত্তমপুরের জমিদার।

পয়লা নম্বর।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এত বড় একটা আবির্ভাব আমি হয়ত জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবী'তে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্চে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্ম্মটি খুব মজবুৎ ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারিদিকে যে সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু আধুনিক কালের বড়মানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশী, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু হাত দু পা এক মুণ্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথামুণ্ড বেড়ে গেচে তারা হল দৈত্য। অহরহ দুদ্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গ মর্ত্তকে অতিষ্ঠ করে তোলে! তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের পরে মন দেবার কোনই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্চে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্য্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝলুম সিতাংশু মৌলি সেই দলের মানুষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে

তা আমি পূর্ব্বে জানতুম না। গাড়ি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে সে যেন দশ মুণ্ড বিশ হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় 'আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মত আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন কি, এখানে সেই পথ-চল্‌তি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোন আধুনিক বাঙালী কবির রচনাসম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড "হেইয়ো" গর্জ্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা খোলা ব্রুহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর কি! যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্চেন, পাশে তাঁর কোচমান বসে। বাবু সবলে দুই হাতে রাস টেনে ধরেচেন। আমি কোনমতে সেই সঙ্কীর্ণ গলির পার্শ্ববর্ত্তী একটা তামাকের দেকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করলুম। দেখলুম আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ। কেননা যিনি অসতর্কভাবে রথ

হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি। পদাতিকের দুটিমাত্র পা, সে হচ্চে স্বাভাবিক মানুষ। আর যে-ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক বাহুল্যের দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথী সবাইকেই যথাসময়ে ভুলে যেতুম। কারণ এই পরমাশ্চর্য্য জগতে এরা বিশেষ করে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোলমাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের বেশী জবর দখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই আমার তিন নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সঙ্গীতের যে তাল দিতে থাকে তাতে আমাব ঘুম সর্ব্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোর বেলায সেই

আট দশটা ঘোড়াকে আট দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁহার উড়ে বেহারা, ভোজপুরী বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বর সংযম কিম্বা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্চে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়ত ঘুমের ব্যাঘাত হত না কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্চে পরিমাণ-সুষমা, অপর পক্ষে একদা যে দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দন-শোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থলিকে বাহন করে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেচে। তাকে যদি বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ে এসে পড়ে—এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার দ্বৈতগুলি তখনো কেউ আসে নি ; আমি বসে বসে জোয়ার ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম এমন সময়ে আমাদের বাড়ির দরজা পেরিয়ে

পয়লা নম্বর।

আমার প্রতিবেশির একটা স্মারক-লিপি ঝন্ ঝন্ শব্দে আমার শার্সির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ির চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতি-কাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশী করে আছেন; আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। এঁকে ডেকে পাইনে, হেঁকে বিচলিত করতে পারিনে—দুর্লভতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুট্‌ছে। খবর পেলুম প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলুম কেবল যে আমাব শার্সি ভাঙচে, আমার শান্তি ভাঙচে তা নয়, আমার অনুচর পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠ্‌চে, সেটা তেমন আশ্চর্য্য নয় কিন্তু আমার দ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রধান সর্দ্দার কানাইলালের মনটাও

দেখচি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়, অন্তঃকরণ মূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম এমন সময় একদিন লক্ষ্য করে দেখলুম সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম করে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুট্‌চে। বুঝলুম এই উপলক্ষ্যে প্রতিবেশির সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ার মত নয়—শুধু অমৃতে ওর পেট ভরবে না।

আমি পয়লা নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বল্‌তুম সাজ সজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রঙীন মেঘ দিয়ে আকাশ মুড়ি দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় সরে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল এক দিন প্রতিবাদ করে বল্লে, "মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি এ পাশ করেচে।" কানাইলাল স্বয়ং বিএ পাশ করা, এ জন্য ঐ ডিগ্রিটা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পারলুম না। পয়লা নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন, কর্ণেট, এসরাজ এবং চেলো। যখন-তখন তার পরিচয় পাই। সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে

সুরাচার্য্য বলে অভিমান করিনে। কিন্তু আমার মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি,—তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত। আজও যে সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালবাসে। কিন্তু দেখ্‌তে পেলুম আমার দ্বৈত দলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা নম্বরে চেলো বেজে উঠ্‌লেই যারা গাণিতিক ন্যায় শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা নম্বরের দিকে হেল্‌চে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বল্‌লে, পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জুটেচে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই ত ভাল হয়।

বড় খুসি হলুম। আমার দলের লোকদের বল্লুম, "দেখেচ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে। তাই, যে সব জিনিস প্রমাণযোগে বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না কিন্তু যে সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বল্লে "যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য,

ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলোর মাহাত্ম্য, পতি দেবতা পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বল্লুম, "না হে, এই দেখ না আমরা এই পয়লা নম্বরের জাঁক জমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেচি কিন্তু অনিলা ওর সাজসজ্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দু'তিনবার বাড়া বদলের কথা বল্লে। আমার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মত অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেল বেলায় দেখা গেল কানাইলাল এবং সতীশ পয়লা নম্বরে টেনিস্ খেলচে। তার পরে জনশ্রুতি শোনা গেল যতী আর হরেন পয়লা নম্বরে সঙ্গীতের মজলিশে একজন বক্স হার্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া তবলায় সঙ্গত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান করে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেচে। এদের আমি পাঁচ ছ' বছর ধরে জানি কিন্তু এদের যে এ সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষতঃ আমি জানতুম অরুণের প্রধান সখের বিষয় হচ্চে তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব, সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কি করে বুঝব?

সত্য কথা বলি আমি এই পয়লা নম্বরকে মুখে যতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলুম। আমি চিন্তা

করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড় বড় সমস্যার সমাধান করিতে পারি—মানসিক সম্পদে সিতাংশু মৌলিকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেচি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি ত লোকে হাসবে। সকাল বেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরত—কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম আর ভাবতুম, আহা আমি যদি এই রকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম! পটুত্ব বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সুর ভালো বুঝিনে কিন্তু জানলা থেকে কত দিন গোপনে দেখেচি সিতাংশু এস্রাজ বাজাচ্চে। ঐ যন্ত্রটার পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্য্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী নারীর মত ওকে ভালবাসে—সে আপনার সমস্ত সুর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে দিয়েচে। জিনিষ-পত্র বাড়ি ঘর জন্তু মানুষ সকলের পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্ব্বচনীয়, আমি

এ'কে নিতান্ত দুর্লভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম পৃথিবীতে কোন কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনিই এরকাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা নম্বরে টেনিস খেল্‌তে কন্সার্ট বাজাতে লাগল তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে মনের মত অন্য বাসা বরানগর কাশিপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বল্‌তে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ার ঘরেও পেলুম না, রান্না ঘরেও না। দেখি শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বল্লুম, "পর্শুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বল্লেন "আর দিন পনেরো সবুর কর।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?"

অনিলা বল্লেন "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরবে—তার জন্য মনটা উদ্বিগ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভাল লাগচে না।"

পয়লা নম্বর।

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করিনে। সুতরাং আপাতত কিছুদিন বাড়ি বদল মুলতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে বেরবে সুতরাং দুই নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈত দলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে ত?" সে কোন জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে আছে।

আমি বল্লুম, "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাটনি ওদের খুব ভাল লাগে, সেটা ভুলো না" এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বল্লুম, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "সে কি কথা? আজ আমাদের সভা হবে না কি?"

আমি বল্লুম, "হবে বৈ কি। সমস্ত তৈরি আছে— ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বের্গসঁর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন কি আমড়ার চাটনি পর্য্যন্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বল্লে, "অদ্বৈত বাবু, আমি বলি আজ থাক্।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করে মরেচে। পরীক্ষায় সে পাশ হতে পারে নি তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিল—সইতে না পেরে গলায় চাদর বেঁধে মরেচে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কোথা থেকে শুনলে?"

সে বল্লে, "পয়লা নম্বর থেকে।"

পয়লা নম্বর থেকে!—বিবরণটা এই:—সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না করে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে

থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল অযোধ্যার কাছে থেকে রাত্রে সিতাংশু মৌলি এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিসকে ঠাণ্ডা করে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সৎকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তখন অন্তঃপুরে গেলুম। মনে করেছিলুম অনিলা বুঝি দরজা বন্ধ করে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েচে। কিন্তু এবারে গিয়ে দেখি ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাটনির আয়োজন করচে। যখন লক্ষ্য করে তার মুখ দেখলুম তখন বুঝলুম একরাত্রে তার জীবনটা উলট পালট হয়ে গেচে।

আমি অভিযোগ করে বল্লুম, "আমাকে কিছু বল নি কেন?"

সে তার বড় বড় দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে, কোন কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোট হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বল্‌ত, "তোমাকে বলে লাভ কি?" তাহলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাক্‌ত না। জীবনের এই সব বিপ্লব, সংসারের সুখ দুঃখ নিয়ে কি করে যে ব্যবহার করতে হয় আমি কি তার কিছুই জানি?

পয়লা নম্বর।

আমি বল্লুম, "অনিল, এ সব রাখ, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বল্লে, "কেন হবে না, খুব হবে। আমি এত করে সমস্ত আয়োজন করেচি সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বল্লুম, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।"

সে বল্লে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম অনিলের শোকটা তত বেশি কিছু নয়। মনে করলুম, সেই যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড় বড় বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেচে। যদিচ সব কথা বোঝবার মত শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু পার্সোনাল্ ম্যাগ্নেটাজ্ম্ বলে একটা জিনিস আছে ত।

সন্ধ্যার সময় আমার দ্বৈত দলের দুই চার জন কম পড়ে গেল। কানই ত এলই না। পয়লা নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশুমৌলি চলে যাচ্চে তাই এরা

সেখানে বিদায় ভোজ খেতে গেছে। এদিকে অনিলা আজ যে রকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনো দিনই করে নি। এমন কি, আমার মত বেহিসাবী লোকেও একথা না মনে করে থাকতে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সে দিন খাওয়া দাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখনি শুতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম "শোবে না?" সে বল্লে, "বাসন গুলো তুল্‌তে হবে।"

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি আমার চশমা চাপা দেওয়া এক টুক্‌রো কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে— "আমি চল্লুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।"

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স—সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না—এমন কি তার হাতের চুড়ি বালা পর্য্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের মোড়কে

করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা কিছু জমে ছিল তাব শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন কোসন জিনিষ পত্রের ফর্দ্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সঙ্গে গয়লা বাড়ির এবং মুদির দোকানের হিসাব ও টাকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এই টুকু বুঝতে পারলুম অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখ্‌লুম—আমার শ্বশুর বাড়িতে খোঁজ নিলুম কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘট্‌লে সে সম্বন্ধে কি রকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয় কোন-দিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। বুকের ভিতরটা হা হা করতে লাগ্‌ল। হঠাৎ পয়লা নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায় তামাক টানচে। রাজাবাবু ভোর রাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাঁক করে উঠ্‌ল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানবসমাজের পুরাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার, টলষ্টয়, টুর্গেনীভ প্রভৃতি বড় বড় গল্প-লিখিয়েদের বইয়ে

পয়লা নম্বর।

যখন এই রকমের ঘটনার কথা পড়েচি তখন বড় আনন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে তার তত্ত্ব কথা বিশ্লেষণ করে দেখেচি। কিন্তু নিজের ঘরেই যে এটা এমন সুনিশ্চিত করে ঘট্‌তে পারে তা কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সাম্‌লে নিয়ে আমি প্রবীন তত্ত্ব-জ্ঞানীর মত সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হাল্‌কা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। যে দিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেই দিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাসলুম। মনে করলুম মানুষ কত আকাঙ্ক্ষা কত আয়োজন কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কতদিন কত রাত্রি কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে বলে চোখ বুজে ছিলুম এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি বুদ্বুদ ফেটে গিয়েচে। গেছে যাক্‌গে —কিন্তু জগতে সবই ত বুদ্বুদ নয়। যুগযুগান্তরের জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রম করে টিঁকে রয়েচে এমন সব জিনিসকে আমি কি চিন্‌তে শিখি নি?

কিন্তু দেখলুম হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্য-কালের জ্ঞানীটা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দার ছাতে পায়চারি করতে করতে শূন্য বাড়িতে ঘুরতে

ঘুরতে শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাক্‌তে দেখেচি একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মত সমস্ত জিনিস পত্র ঘাঁটতে লাগ্‌লুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজটা হঠাৎ টেনে খুল্‌তেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লা নম্বর থেকে এসেচে। বুকটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু যেখানে বড় বেদনা সেই খানেই ভয়ঙ্কর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন চার টুক্‌রো করে ছেঁড়া। মনে হল পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেচে। সে চিঠিখানা এই :—

"আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেল তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা'বলবার কথা তা আমাকে বল্‌তেই হবে।

আমি তোমাকে দেখেচি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্চি কিন্তু দেখবার মত দেখা আমার

পয়লা নম্বর।

জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দ্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েচ—আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম—যে-তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্ব্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েচি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবেনা জানি—কিন্তু আমাকে ভুলে বুঝো না। আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারি এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পার তাতে তোমারও ভাল হবে। আমি কে সে-কথা লেখবার দরকার নেই কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপনে থাক্‌বে না।"

এমন পঁচিশ খানি চিঠি। এর কোন চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোন নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে

উঠ্ত ;—কিম্বা তাহলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তব গান নীরব হত।

কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেচে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখ্‌লুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দ্দা কত মোটা পর্দ্দা না জানি। পুরোহিতের হাতে থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্য ন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখেচি। সুতরাং যাকে আমি কোন দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কি-বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব?

শেষ চিঠি খানা এই ঃ—

"বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেচি তোমার বেদনা! এই খানে বড় কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাক্‌তে চায় না। ইচ্ছা করে স্বর্গমর্ত্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে

উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয় তোমার দুঃখই তোমার অন্তর্য্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোর বেলা পর্য্যন্ত মেয়াদ নিয়েচি। এর মধ্যে যদি কোন দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তাহলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব—এক মনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক।"

বোঝা যাচ্চে দ্বিধা দূর হয়ে গেচে—দুজনার পথ এক হয়ে মিলেচে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠ্‌ল—ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কতকাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভাল লাগে না। অনিলকে একবার কোন মতে দেখবার জন্য মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম সিতাংশু তখন মসূরি পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেচি কিন্তু তার সঙ্গে ত অনিলকে দেখি নি। ভয় হল পাছে তাকে অপমান করে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম।

সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু বল্লে "আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটি মাত্র চিঠি পেয়েচি—সেটি এই দেখুন।"

এই বলে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোট এনামেল করা সোনার কার্ড কেস্ খুলে তার ভিতর থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, "আমি চল্লুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।"

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ। এবং যে নীল রঙের চিঠির কাগজের অর্দ্ধেকখানা আমার কাছে, এই টুক্‌রোটি তারি বাকি অর্দ্ধেক।

তপস্বিনী।

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথম রাত্রে গুমট গেছে, বাঁশ গাছের পাতাটা পর্য্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারা গুলো যেন মাথাধরার বেদনার মত দব্‌দব্‌ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নীচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায় খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুরঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তারপরে বিদ্যারত্ন মশায় আসেন; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূলগ্রন্থ হইতে পড়িবে এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকরনার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাৎ থাকে

—সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প! নামের সঙ্গে মাখন বাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড় শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বিএ পাশ না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুষটি সৌখীন। জীবন-নিকুঞ্জের মধু সঞ্চয়ের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই সয় না। বড় আশা করিয়াছিল বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একটু আরামে থাকিবে. এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটগুলো সদরেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরো বেশী প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলের পণ্ডিত মশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতম মুনি। বলা বাহুল্য, সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিত মশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেড মাষ্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক, এইরূপ বড় বড় দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদ্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যাঁরা পরীক্ষাসাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন সব নামজাদা মাষ্টার রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যযুগে সিদ্ধি-লাভের জন্য বড় বড় তপস্বী যে তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা—কিন্তু মাষ্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই যে যৌথ তপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃসহ। সেকালের তপস্যার প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা তাপসের তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্ম্মারা; তারা বরদাকে বড় জ্বালাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল করিল তখন তার সান্ত্বনা হইল এই যে, সে যশস্বী মাষ্টার মশায়দের মাথা হেঁট করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্য নিষ্ফলতাতেও মাখন বাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর একদল মাষ্টার নিযুক্ত হইল, তাঁদের সঙ্গে রফা হইল এই যে বেতন ত তাঁরা পাইবেনই তারপরে বরদা যদি ফার্ষ্ট ডিবিজনে পাশ করিতে পারে তবে তাঁদের বক্‌শিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে

একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে একজামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বড়ি খাইল এবং ধন্বন্তরীর কৃপায় ফেল করিবার জন্য তাকে আর সেনেট হল পর্য্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মত এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বুঝিল এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে তৃতীয় বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরো একটা বৎসর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরো বেশী করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মত ভয় করিত তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল "এখানে থাক্‌লে আমার পড়াশুনো হবে না" মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?" সে বলিল, "বিলাতে।" মাখন তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার

যে গোলটুকু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এণ্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেঞ্চিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড় একজামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি এ পাস করা চাই।

এও ত বড় মুস্কিল! বি এ পাস না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বি এ পাস না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্ম মৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি এ পাস বিন্ধ্য-পর্ব্বতের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, নড়িতে চড়িতে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কি? তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বি এ পাসে লাগিয়াছেন?

খুব একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, বারবার তিনবার; এইবার কিন্তু শেষ। আর একবার পেন্সিলের দাগ দেওয়া কী-বইগুলা তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন সময় একটা আঘাত পাইল; সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে

যাইবার গাড়ি ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, দুই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি? স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছুই শক্ত নয় কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কি কৈফিয়ৎ দিবে?

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায় আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর একটা পথ খোলা আছে যেটা বি এ পাসের অধীন নয়, এবং যেটাতে দারা সুত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয়, সন্ন্যাসী হওয়া। এই চিন্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তারপর একদিন দেখা গেল স্কুল ঘরের মেঝের উপর তার কাঁ-বইয়ের ছেঁড়া টুক্‌রোগুলো পরীক্ষা দুর্গের ভগ্নাবশেষের মত ছড়ানো পড়িয়া আছে—পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের উপব এক টুক্‌রা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা—তাহাতে লেখা "আমি সন্ন্যাসী—আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দ স্বামী।"

তপস্বিনী।

মাখন বাবু কিছুদিন কোন খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কা-বইগুলার ছেঁড়া টুক্‌রা সাফ হইয়া গেছে—আর সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা, তেলের দাগে মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার ত্রুটি মোচনের জন্য একটা পুরাতন এটলাসের মলাট পাতা; একধারে একটা শূন্য প্যাকবাক্সের উপর একটা টিনের তোরঙ্গে বরদার নাম আঁকা; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাটছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলা পাতা, এবং মলাটে রাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগডেন কোম্পানির সিগারেটবাক্সবাহিনী বিলাতী নটীদের মূর্ত্তি ঝরিয়া পড়িবে। সন্ন্যাস আশ্রয়ের সময় পথের সান্ত্বনার জন্যে এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই তাহা হইতে বুঝা যাইবে তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের ত এই দশা; নায়িকা ষোড়শী তখন

সবে মাত্র ত্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্য্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, শ্বশুর বাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্য্যন্ত বাধিত না। শাশুড়ি ছিলেন চিররুগ্না—কর্ত্তার কোন বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন কি মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিস্‌-শাশুড়ির ভাষা ছিল খুব প্রখর, বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন। তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কৌলীন্যের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া এবাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে সে বেশী দিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন তখন অন্তর্যামী বুঝিতেন ব্যর্থ মুক্তাহারের জন্য যে আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে মুক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে সে কথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি বলিতেন, দাদা কেন যে এত মাষ্টার পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা ত বুঝিনে, লিখে

পড়ে দিতে পারি বরদা কথনই পাস করতে পারবে না।
"পারিবেনা" এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল কিন্তু সে একমনে কামনা করিত যেন কোন গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথম বার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাষ্টারের ব্যূহ বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিলেন—পিসি বলিলেন, "ধন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও ত শেখে!" তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; যে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব প্রথমের চেয়েও আরো আরো আরো অনেক বড় হইয়া পাস করে—এত বড়, যে স্বয়ং লাট সাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন, এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মত আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, "ছেলের এদিকে বুদ্ধি নেই ওদিকে আছে।" লাটসাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায়

তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড় আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া-যাওটাকেও পূরা দাম দিল না। সবাই বলিল, "এই দেখ না, এল বলে!" ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, "কথ্‌খনো না! ঠাকুর লোকের কথা মিথ্যা হোক্! বাড়ির লোককে যেন হায় হায় করতে হয়!"

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন—তার কামনা সফল হইল। এক মাস গেল বরদার দেখা নাই; কিন্তু তবু কারো মুখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে কিন্তু বাহিরে সেটা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখোচোখি হইলে তাঁর মুখে যদিবা বিষাদের মেঘসঞ্চার দেখা যায় পিসির মুখ একেবারে জ্যৈষ্ঠমাসের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে, আশঙ্কা পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে! এম্‌নি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন, ছেলেটা বাড়ির সকলকে

মিথ্যা উদ্বিগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ সুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন সে কথা পিসিও বলিতে সুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে কিন্তু মানুষটি বড় ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল, ততই তার স্বভাব যে অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল, এমন কি, সে যে তামাকটা পর্য্যন্ত খাইত না এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিত মশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্যই ত তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বুদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়াছিল। পিসি প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন— "বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কি ছিল? টাকার ত অভাব নাই। যাই বল বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা সোনার টুকরো ছেলে!" তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারশুদ্ধ সকলেই তার প্রতি

অন্যায় করিয়াছে সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বৌমা যাতে সুখে থাকে মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড় ইচ্ছা, ষোড়শী তাঁকে এমন-কিছু ফরমাস্ করে যেটা দুর্লভ—অনেকটা কষ্ট করিয়া লোকসান করিয়া তিনি তাকে একটু খুসি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন,—তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মত হইতে পারে।

(২)

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চির-পরিচিত সংসারটা তাকে চারদিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিংটা, আলিসার উপর যে কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আল্‌নাটা, আলমারিটা

—তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে. সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব চেয়ে আপন। কেননা, তার "ঘর হৈল বাহির, বাহির হৈল ঘর।"

একদিন যখন বেলা দশটা, অন্তঃপুরে যখন বাটি বারকোস ধামা চুপড়ি শিলনোড়া ও পানের বাক্সের ভিড় জমাইয়া ঘরকরনার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জালনার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ "জয় বিশ্বেশ্বর" বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছের অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্তু মীড়টানা বীণার তারের মত চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, পিসিমা, ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভোগের আয়োজন কর।

এই সুরু হইল। সন্ন্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে শ্বশুরের কাছে বধূর আবদারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া

বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালো রকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখন বাবুর কিছুকাল হইতে আয় কমিতে ছিল কিন্তু তিনি বারো টাকা সুদে ধার করিয়া সৎকর্ম্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও যথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নয় মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কি! বিশেষতঃ জটাধারীরা যখন আহার আরামের অপরিহার্য্য ত্রুটি লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপুরে একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই—পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে। কেননা কি জানি!—বরদার যে ফটোগ্রাফ খানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফ দাড়ি জটাজুট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটাব যে কি রকম অভিব্যক্তি হইতে পারে

তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে বুঝি কিছু কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায় কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্য রকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবন যৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই ঘেরিয়া তার সংসারের সমস্ত আয়োজন। সকালে উঠিয়াই ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়,—এর আগে রান্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালানো থাকে। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে, কাল হয়ত আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌঁছিবে, এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গড়িয়াছিলেন, তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্ত্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তা'র সত্তা, তেজঃপুঞ্জ তা'র দেহ, গভীর তা'র জ্ঞান, অতিকঠোর

তাঁর ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার? সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরইত পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার শ্বশুরও যে এই পূজার প্রধান পূজারি, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কিছু ছিল না।

কিন্তু সন্ন্যাসী প্রতিদিনই ত আসে না। সেই ফাঁক-গুলো বড় অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শোয়, একবেলা যা খায় তার মধ্যে ফল মূলই বেশী। গায়ে তার গেরুয়া রঙের তসর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিঁথির অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্দুরের রেখা। ইহার উপরে শ্বশুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া সুরু করিল। মুগ্ধবোধ মুখস্ত করিতে তার অধিক দিন লাগিল না—পণ্ডিত মশায় বলিলেন, এ'কেই বলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা।

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধ্বী স্ত্রীর পায়ের ধূলা ও আশীর্ব্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল,

৪৯

—এমন কি স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভয়ে সম্ভ্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রং ত তার গায়ের তসরের রঙের মত সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ যে ঝির ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহ মনের উপর কোন্ একজনের কাণে কাণে কথার মত আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল জানালার কাছে বসিয়া, তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির সুর আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক একদিন তার সমস্ত মন যেন অতি-চেতন হইয়া ওঠে; রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ করে সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে পণ্ডিত মশায় গীতা পড়িয়া ব্যখ্যা করিতেছেন সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়, অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুক্‌নো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালী খস্‌খস্ করিয়া গেল, বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চীলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুর পাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত

শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে ত কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ—পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তাঁর চতুর্ম্মুখের বেদবেদান্ত উচ্চারণের অনেক পূর্ব্বের সৃষ্টি, যার রঙের সঙ্গে, ধ্বনির সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে তারই ছোটবড় হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাস মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে—ষোড়শী ত কৃচ্ছ্র-সাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজো সে পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুয়া রংকে আরো ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিত মশায়কে ধরিয়া পড়িল আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন। পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার ত এ সকল পন্থায় প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি ত পাকা আমলকীর মত আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" তার পুণ্যপ্রভাব লইয়া চারিদিকে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল বাড়ির ঝি চাকর পর্য্যন্ত তাকে কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে,

তাই আজ যখন তাকে পুণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল তখন তার বহুদিনের গৌরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে একথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাধে তাই পণ্ডিত মশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বল ত?

মাখন বলিলেন, সেটা না শিখিলেও ত বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যতদূরে গেছ সেই খানেই তোমার নাগাল ক'জন লোকে পায়?

তা হউক প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুর্দ্দৈব যে, মানুষও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালীই মোটামুটী তাঁরই মত—অর্থাৎ খায়দায় ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর কোন অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলা দেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে খাঁটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণ-প্রতিপদের ভোর বেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং

সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলে বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত—কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য্য দেবীলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাখী হইয়া দেখা দিলেন। পাখীর ল্যাজে তিনটি মাত্র পালক ছিল; একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাটকিলে;—এই পালক তিনটী যে সত্ত্ব রজ তম, ঋক্ যজুঃ সাম, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, আজ কাল পর্শু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেল্কী লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরী হইতেছে; দুইজন এম্ এস্ সি ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সাব্ জজ্ তাঁর সমস্ত পেন্সেন্ এই নৈমিষারণ্য ফণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাগ্‌নেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য কমিটির গৃহীসভ্য হইতে হইল। গৃহীসভ্যের কর্ত্তব্য নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী সভ্যদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহীসভ্যদের শ্রদ্ধার পরিমাণ অনুসারে, এই ষষ্ঠ অংশ,

অনেক সময় থার্ম্মমিটরের পারার মত সত্য অঙ্কটার উপরে নীচে ওঠা নামা করে। অংশ কসিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নীচের অঙ্কের দিকে। কিন্তু এই ভুলচুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা পূরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড় কিছু বাকী রহিল না, এবং তার মাসহারার টাকা প্রতিমাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ীর ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, "দাদা, কর্‌চ কি? মেয়েটা যে মারা যাবে।"

মাখন উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন "তাইত, কি করি!" ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে তাঁকে আসিয়া বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিঁক্‌বে?"

ষোড়শী একটুখানি হাসিল, তার মর্ম্মার্থ এই, এমন সকল বৃথা উদ্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

(৩)

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে, এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ। একদিন ষোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কি না, তা আমি কেমন করে' জানব?"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন, তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"কেমন করে জান্‌লেন ?"

"সে কথা এখনো তুমি বুঝবে না। কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো স্ত্রীলোক হয়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েচ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দূরে থেকেও তোমাকে সহধর্ম্মিণী করে নিয়েচেন।"

ষোড়শীর শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্ব্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন তা' কি জান্‌তে পারি ?"

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন, তার পরে বলিলেন, "একখানা আয়না নিয়ে এস।"

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দ্দেশমত তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আধঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু দেখতে পাচ্চ ?"

ষোড়শী দ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ, যেন কিছু দেখা যাচ্চে কিন্তু সেটা যে কি তা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌চি নে।"

"শাদা কিছু দেখ্‌চ কি ?"

"শাদাই ত বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মত ?"

"নিশ্চয়ই বরফ! কখনো পাহাড় ত দেখি নি তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।"

এইরূপ আশ্চর্য্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লঙ্‌চু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য্য কাণ্ড।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল সাধনা আরো অনেক বেশী কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষমাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার

গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল সেই লঙচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেই দিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়ই সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলেন, "মা এতদিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিলুম দরকার হবে না কিন্তু আব চল্‌চে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েচে, কোন্ দিন আমার বিষয় ক্রোক করে বলা যায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্ম্মিণী করিতেছেন--- বিষয়ের যেটুকু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন। কেবল উত্তরে হাওয়া নয় এই যে দেনা এও সেই লঙচু পাহাড হইতে আসিয়া পৌঁছিনেছে, এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, "ভয় কি বাবা?"

মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁড়াই কোথায়?"

ষোড়শী বলিল, "নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাকব।"

মাখন বুঝিলেন ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড় পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিনতে পারচেন না?"

"একি? বরদা নাকি?"

বরদা জাহাজের লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন এক কাপড় কাচা কল কম্পানির ভ্রমণকারী এজেণ্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড় কাচা কলের দরকার থাকে খুব সস্তায় করে' দিতে পারি।" বলিয়া ছবি আঁকা ক্যাটলগ্ পকেট হইতে বাহির করিল।

তোতা-কাহিনী।

(১)

এক যে ছিল পাখী। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখী ত কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখীটাকে শিক্ষা দাও!"

(২)

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখীটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, "উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কি?"

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখী যে-বাসা বাঁধে, সে-বাসায় বিদ্যা বেশী ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুসি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

(৩)

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য্য যে, দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ!" কেহ বলে, "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা ত হইল। পাখীর কি কপাল!"

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বক্‌শিস্ পাইল। খুসি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ীর দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখীকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, "অল্প পুঁথির কর্ম্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পুঁথি লিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্ব্বত-প্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না!"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারীর

সীমা নাই। মেরামত ত লাগিয়াই আছে। তারপরে ঝাড়া মোছা পালিস করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে!" লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাস্‌তুতো ভাইরা খুসি হইয়া কোঠা বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

(৪)

সংসারে অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক যথেষ্ঠ। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে কিন্তু পাখীটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

(৫)

শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর তেজে চালতেছে রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরি দামামা কাঁশি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিস্তুতো খুড়তুতো এবং মাস্তুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ কাণ্ডটা দেখিতেছেন!"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য্য! শব্দ কম নয়!"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয় পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুসি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতীতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখীটাকে দেখিয়াছেন কি?"

রাজার চমক লাগিল, বলিলেন, "ঐ যা! মনে ত ছিল না! পাখীটাকে দেখা হয় নাই।"

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখীকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।"

দেখা হইল। দেখিয়া বড় খুসি! কায়দাটা পাখীটার চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখীটাকে দেখাই যায় না, মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখীর মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান ত বন্ধই—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-বর্দ্দারকে বলিয়া দিলেন নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

(৬)

পাখীটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখী চায় আর অন্যায়রকমে পাখা ঝট্‌পট্ করে। এমন কি, এক একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "একি বেয়াদবি!"

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার

আসিয়া হাজির। কি দমাদ্দম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখীর ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখীদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয় কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম এক হাতে সড়কি লইয়া এম্নি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা!

কামারের পসার বাড়িয়া কামার-গিন্নির গায়ে সোনা-দানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁসিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

(৭)

পাখীটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ ত ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখী মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখীটার শিক্ষা পূরো হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়?"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে ?"

"না।"

"আর কি গান গায় ?"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায় ?"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখীটাকে আন ত, দেখি।"

পাখী আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

কর্ত্তার ভূত।

(১)

বুড়ো কর্ত্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠ্‌ল, "তুমি গেলে আমাদের কি দশা হবে?"

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। বল্‌লে, "আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখ্‌বে কে?"

তা' বলে' মরণ ত এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বল্‌লেন, "ভাবনা কি? লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্ না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের ত মৃত্যু নেই।"

(২)

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেননা, ভবিষ্যৎকে মান্‌লেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মান্‌লে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্য মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাব-দোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাব্‌তে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায়

ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, "এই চোখ বুজে চলাই হচ্চে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা। এ'কেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চল্‌ত; ঘাসের মধ্যে গাছের মধ্যে আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।"

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভূতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এই জন্যে ভেবে পাওয়া যায় না সেটাকে ফুটো করে কি উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে-ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে একছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, —বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তা'তে করে' ভূতের রাজত্বে আর কিচ্ছুই না থাক্‌,—অন্ন বা বস্ত্র বা স্বাস্থ্য—শান্তি থাকে।

কত যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব

কর্ত্তার ভূত।

দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওঝা-কেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেচে।

(৩)

এই ভাবেই দিন চল্‌ত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগ্‌ত না; চিরকালই গর্ব্ব করতে পার্‌ত যে এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভ্যাড়ার মত ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা-ও করে না, ম্যা-ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে; যেন একেবারে চিরকালের মত মাটি!

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুস্কিল বাধ্‌ল। সেটা হচ্চে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় ওদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখ্‌বার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্য নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ঙ্কর সজাগ আছে।

(৪)

এদিকে দিব্য ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে "খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো।"

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার-অভিভাবকের পক্ষে; আর পাড়ার কথা ত বলাই আছে।

কিন্তু "বর্গি এলো দেশে।"

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে। দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল "এমন হল কেন?"

তারা একবাক্যে শিখা নেড়ে বল্‌লে, "এটা ভূতের দোষ নয়, ভুতুরে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন?"

শুনে সকলেই বল্‌লে, "তা ত বটেই!" অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ করলে।

দোষ যারই থাক্, খিড়্‌কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। একদিক থেকে এ হাঁকে, "খাজ্‌না দাও!" আরেক দিক থেকে ও হাঁকে "খাজ্‌না দাও!"

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে, "খাজ্‌না দেব কিসে?"

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুল্‌বুলি এসে বেবাক্ ধান খেয়ে গেল, কারো হুঁস ছিল না। জগতে যারা হুঁসিয়ার এরা তাদের কাছে

ঘেঁষ্‌তে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়। কিন্তু তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, "বেহুঁস্ যারা তারাই পবিত্র, হুঁসিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁসিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।"

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

(৫)

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না। খাজ্‌না দেব কিসে?"

শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে' তার উত্তর আসে, "আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান্ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।"

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরো একটা প্রশ্ন উঠে পড়েচে "ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চল্‌বে?"

শুনে ঘুম-পাড়ানী মাসি পিসি আর মাস্‌তুত পিস্‌তুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, "কি সর্ব্বনাশ! এমন প্রশ্ন ত বাপের জন্মে শুনি নি। তা হলে সনাতন ঘুমের কি হবে, সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?"

প্রশ্নকারী বলে, "সে ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু আধুনিকতম

বুল্‌বুলির ঝাঁক, আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কি করা যায়?"

মাসি পিসি বলে, "বুল্‌বুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।"

অর্ব্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, "যেমন করে পারি ভূত ঝাড়াব।"

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, "চুপ! এখনো ঘানি অচল হয় নি।"

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

(৬)

মোদ্দা কথাটা হচ্চে বুড়ো কর্ত্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো একটা মানুষ—যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না,—তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, "কর্ত্তা, এখনো কি ছাড়্‌বার সময় হয় নি?"

কর্ত্তা বলেন, "ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়্‌লেই আমার ছাড়া।"

তারা বলে, "ভয় করে যে কর্ত্তা!"

কর্ত্তা বলেন, "সেইখানেই ত ভূত।"

সাহিত্য সংবাদ।

সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—"জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবন-স্মৃতি" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

বঙ্গের কৃতি সন্তান, বর্দ্ধমানের কমিশনার মিঃ জে, এন্ গুপ্ত, আই, সি, এস্ প্রণীত পঞ্চাঙ্ক নাটক "মনীষা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

শিশুতোষ সিরিজের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মিত্র বি. এস্, .সি, (গ্লাসগো), এম্, আর্, স্যান্, আই (লণ্ডন)।
সাঁঝের ভোগ—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ।
কিশোরী—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।
রোমের গল্প—শ্রীরমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এ।
আবার বলো—শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত "বৃন্দাবন কথা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২॥০ টাকা।

স্বর্গীয়া চারুবালা দেবী প্রণীত "খুকুর কথা" শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

উপন্যাস সিরিজের অষ্টম গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গুল-কাশেম প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ মাত্র।

নাট্যপ্রতিভা সিরিজের পঞ্চমগ্রন্থ "দ্বিজেন্দ্রলাল" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "গৃহদাহ" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।

কলিকাতা, ৯৬নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, এল্, এন্, প্রেস হইতে
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীশিশির কুমার
মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

7